ইরিনা ইয়াকোভ্‌লেভা

ছবিতে সেকালের জন্তুজানোয়ার

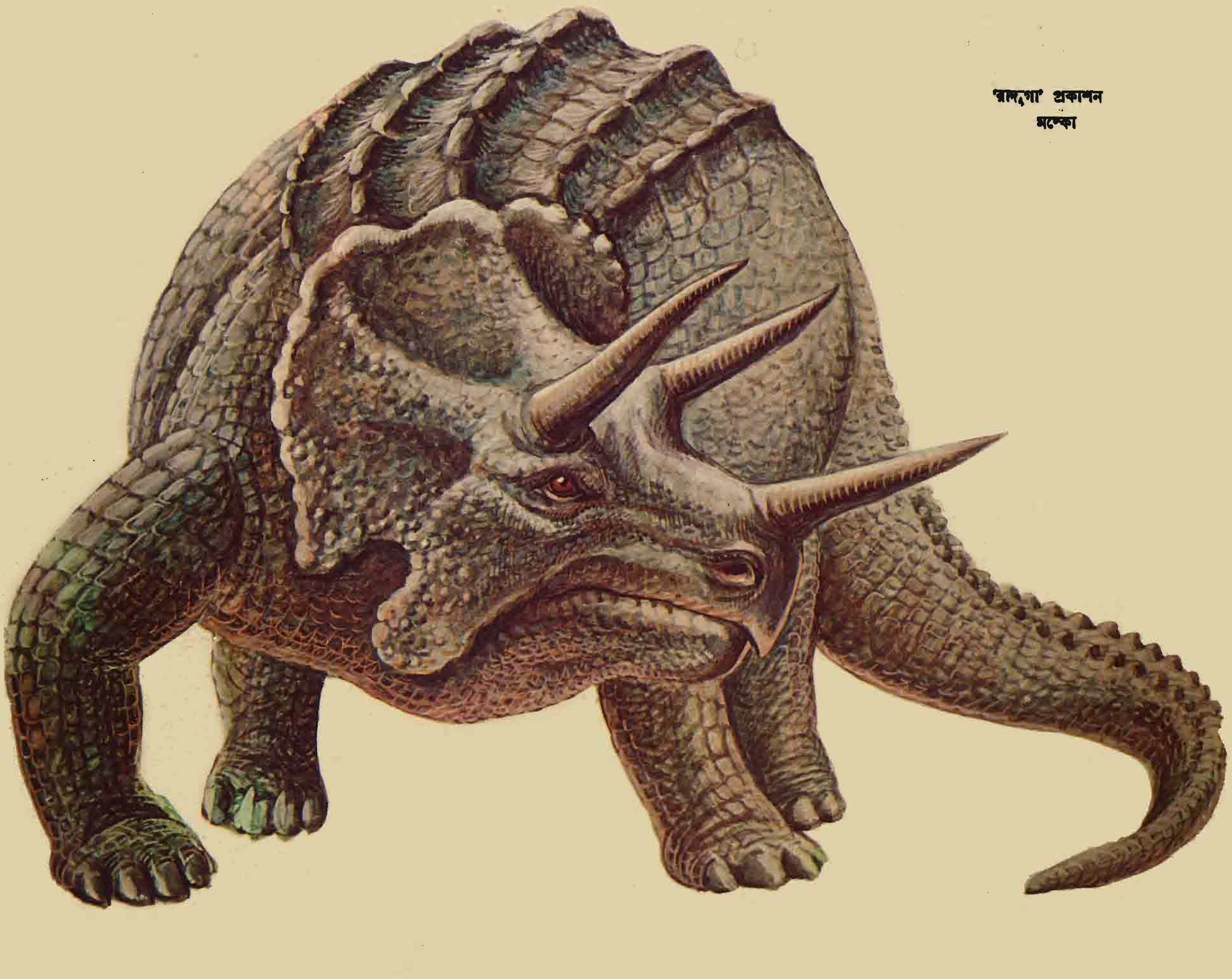

'রাদ্‌গা' প্রকাশন
মস্কো

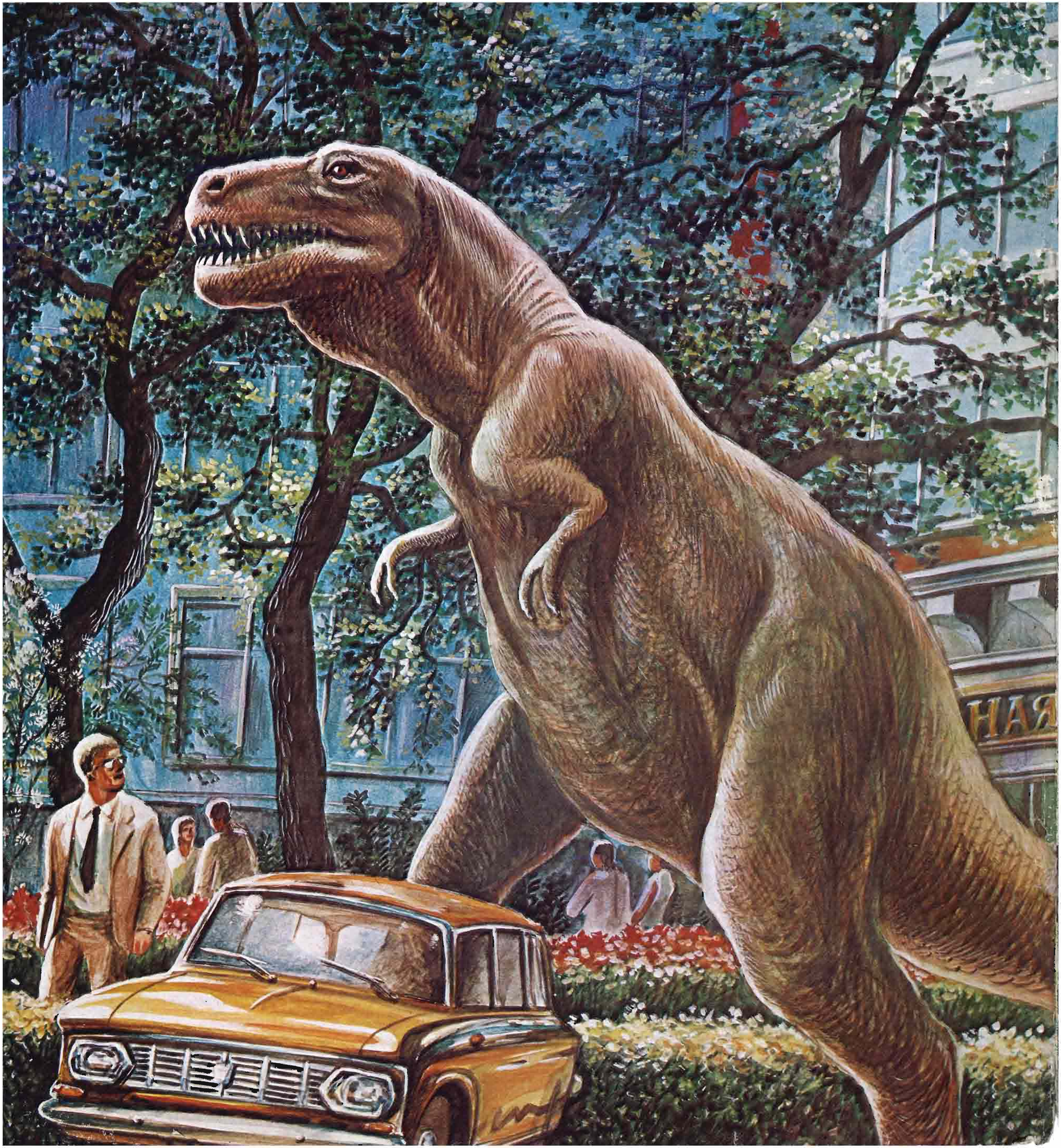

ইরিনা ইয়াকোভ্লেভা

ছবিতে সেকালের জন্তুজানোয়ার

ছবি এঁকেছেন রুবেন ভার্শামভ্

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

প্রাচীন বনভূমির প্রস্তরীভূত বৃক্ষপত্র।

প্রাচীন জীবজন্তুচর্চা — পুরাজীববিদ্যা

নানা জাতির রূপকথায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বহুমুণ্ডধারী ভয়ঙ্কর সাপ, উড়ুক্কু ড্র্যাগন, সামুদ্রিক সাপ, এমন সমস্ত দৈত্যাকার পাখি যারা একেকটা হাতিকে বিড়ালছানার মতো টপ করে তুলে নিতে পারে — এ রকম বহু জন্তুজানোয়ারের কথা পাবে। ঐ সমস্ত দত্যি-দানব না পাবে আমাদের বনেজঙ্গলে, না দূরে দূরে দেশে, না গভীর সমুদ্রের তলদেশে। তা হলে কি রূপকথাকে বিশ্বাস করা যায়? যায় বৈ কি! — বিজ্ঞানীরা বলেন। তাঁরা জানেন যে রূপকথার জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে খুবই মিল আছে, এমন বিকট বিকট জন্তুজানোয়ার সত্যি সত্যিই পৃথিবীতে ছিল — কেবল অনেক অনেক কাল আগে। মানুষ তখনও ছিল না।

ওরা যদি এখন বেঁচে থাকত...

ভেবে দেখ, সেকালের অতিকায় জীবেরা যদি মস্কোর রাস্তায় চলাফেরা করত তা হলে অবস্থাটা কী হত। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ট্যাঙ্ক, ভারী ভারী ক্রেন আর বিশাল বিশাল গ্লাইডারের মতো দেখতে, উদ্ভট চেহারার জন্তুজানোয়াররা শহরের যানবাহন ও লোকচলাচল বন্ধ করে দিত, তারা বাস, ট্রলিবাস উলটেপালটে লণ্ডভণ্ড করে দিত, ইলেকট্রিক তার ছিন্নভিন্ন করে ফেলত, শহরের সমস্ত পার্ক পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দিত। অবশ্য, আসলে এমন ঘটনা কখনই ঘটবে না কেননা প্রাচীন জন্তুজানোয়াররা বহুকাল হল নেই। তারা লক্ষ লক্ষ বছর আগে লোপ পেয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে আমরা জানতে পাই কেবল 'পাথুরে পুথির' পাতা থেকে।

কবে শুকিয়ে গেছে উষ্ণ সমুদ্র, কিন্তু ছোট্ট মাছটা যেন পাথর ভেদ করে সাঁতরে চলেছে ও চলেইছে।

'পাথুরে পুথি' কাকে বলে?

'পাথুরে পুথি' হল পৃথিবী নিজে। আর সে পুথির পৃষ্ঠা — বালি ও কাদামাটির স্তর। এই স্তরগুলিকে দিব্যি আলাদা আলাদা করে চেনা যায় খাড়া পাড়ে, কিংবা গ্যাসের পাইপ পাতার জন্য রাস্তায় যে-নালা খোঁড়া হয় স্রেফ তার ভেতরে। স্তরবদ্ধ পৃষ্ঠাগুলি যত গভীর, তত পুরনো। সবচেয়ে ওপরের স্তরবদ্ধ পৃষ্ঠায় আছে মানুষের ইতিহাস।

আমাদের রাজধানীর রাস্তার অ্যাসফল্টের ঠিক নীচেই আছে পুরনো মস্কোর খোয়া বাঁধানো সদর রাস্তা। তারও নীচে — প্রাচীন মস্কোর কাঠ বাঁধানো বড় রাস্তা। এখানে খুঁজলে মরচে-ধরা তলোয়ার, পুরনো মুদ্রা পাওয়া যেতে পারে।

আর এর নীচ থেকে শুরু হয়েছে সত্যিকারের পাথুরে স্তরবদ্ধ পৃষ্ঠা, কেননা এখানে বালি পরিণত হয়েছে বেলে পাথরে, আর পলিমাটি ও কাদামাটি — প্রস্তরফলকে। এখানে মানুষের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু তা হলে কী হবে, এই পৃষ্ঠাগুলিও মায়াময় রূপকথার পৃষ্ঠা থেকে কোন অংশ কম আকর্ষণীয় নয়।

'পাথুরে পৃষ্ঠার' দর্শন কোথায় মিলতে পারে?

'পাথুরে পুথি' অসম্ভব মোটা। ওপর থেকে শুরু করে নীচ পর্যন্ত ডজন ডজন কিলোমিটারের পৃষ্ঠা। অমনিতে পৃষ্ঠাগুলিও বেজায় ভারী। প্রকৃতি নিজে সাহায্য না করলে মানুষের সাধ্য কি তা খোলে! পাহাড়-পর্বতে ও পাহাড়তলিতে পাথুরে স্তর ধামসে ও ওলটপালট হয়ে থাকে। জল আর বাতাস কুরে কুরে সেগুলির ভেতরে গভীর খাত সৃষ্টি করে, বহু পুরনো পুরনো পৃষ্ঠা মেলে ধরে। ঠিক এই রকম সব জায়গায়ই কোন এক কালে লোকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাড়গোড় দেখতে পায়, তাই দেখে রচনা করে ড্রাগন আর দৈত্য-দানবের গল্প।

'পাথুরে পুথির' বিষয়বস্তু কী?

কঠিন পাথরের মসৃণ গায়ে সরু সরু শিরা-ওঠা ফার্ন গাছের শাখা। ঠিক যেন আঁকা। রবার দিয়ে ঘষে তোলার চেষ্টা করে দেখ দেখি। মোছা যায় না। এ হল প্রাচীন কালের কোন গাছের প্রস্তরীভূত শাখা। তার পাশে পাখা ছড়িয়ে আছে একটা গুবরে পোকা। এটাও শক্ত পাথর হয়ে গেছে। কোন এক সময় পোকাটা এই শাখার ওপর ঘুরঘুর করে বেড়াত।

এই দেখ, হলুদ রঙের স্বচ্ছ অ্যাম্বার পাথর। এ হল প্রাচীন কোন গাছের প্রস্তরীভূত ধুনো। পাথরটার ভেতরে একটা ছোট্ট মশা। আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে সে প্রাচীন ধুনোর আঠায় আটকে গিয়েছিল।

পাথরের চাঁইয়ের ওপর দেখা যাচ্ছে পায়ে-চলা-পথের চিহ্ন — তিন আঙুলের কতকগুলি নখরের ছাপ পড়েছে। মনে হয় যেন কোন কাক কিংবা মুরগী ওর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেছে। কিন্তু ছাপগুলি হাতির পায়ের ছাপের মতো বড় বেশি রকম থপথপে। একটা ছাপ থেকে আরেকটার দূরত্ব কয়েক মিটার। কোন্ সে জীব, যে সুদূর অতীতে এখানে ঘুরে বেড়াত?

কোন এক সময় বোলতাজাতের এই একরত্তি পতঙ্গটি এক ফোঁটা ধুনোর গায়ে বিশ্রাম করার জন্য বসেছিল। কোটি কোটি বছর হল এখন সে বিশ্রাম করছে স্বচ্ছ অ্যাম্বার পাথরের ভেতরে।

মিউজিয়মের বিরাট হলঘরেও এই অতিকায় গিরগিটির কঙ্কালের জায়গা হয়েছে।

হিংস্র গিরগিটির ছোরা-দাঁত কোন রকম মায়ামমতার ধার ধারত না। শো-কেসের কাচের ভেতর থেকে পর্যন্ত সেগুলিকে ভয়ঙ্কর মনে হয়।

এই ড্র্যাগনটিকে আনা হয় গোবি মরুভূমি থেকে।

সাদা চুনা পাথরের গায়ে টানটান হয়ে পড়ে আছে তারামাছ, গুটিসুটি মেরে আছে কাঁটাওয়ালা শামুক, আর সামুদ্রিক গাছগাছড়ার দঙ্গল ভেদ করে যেন চলেছে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক। এ হল সমুদ্রের প্রস্তরীভূত তলদেশ।

'পাথুরে পুথিতে' ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ছবিও আছে। পাথরের ভেতর থেকে হঠাৎ হয়ত ঝলক মেরে উঠল ড্র্যাগন-গিরগিটির খুলির গায়ে ছোরা-দাঁতের পাটি কিংবা হয়ত নৌকোর দাঁড়ের মতো ছড়িয়ে আছে বিকটাকার কাঁকড়া-বিছের লম্বা লম্বা দাড়া।

এই দৈত্যাকার হাড়গুলো আবার কার? হয়ত একচক্ষু দৈত্যেরই হবে?

'পাথুরে পুথির' পাঠক কারা?

'পাথুরে পুথি' পাঠ করেন পুরাজীববিজ্ঞানীরা। গরমকালে তাঁরা অভিযানে যান দূর দূর জায়গায়, পাহাড়-পর্বতে ও মরুভূমিতে এবং সেই সব অঞ্চলে, যেখানে প্রাচীন পৃষ্ঠাগুলি পৃথিবীর উপরিস্তরে উঠে এসেছে। 'পাথুরে পুথি' পড়ে উঠতে পারা কখন কখন বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সচরাচর বিজ্ঞানীদের হাতে পড়ার আগেই রোদ, বাতাস আর বর্ষণ খোলা পৃষ্ঠাগুলির ওপর দিয়ে চলে যায়। 'পাথুরে পৃষ্ঠা' চির খেয়ে যায়। জীবজন্তুর হাড়গোড় এদিক-ওদিক হয়ে জট পাকিয়ে যায়। প্রাচীন শামুক-ঝিনুক, পোকামাকড় ও গাছপালার ছাপ সরে যায় অনেক দূরে। এ রকম একটা পাতা পড়তে বিজ্ঞানীদের অনেক কষ্ট করতে হয়।

কোন কোন সময় পুরাজীববিজ্ঞানীরা একটি হাড় দেখেই বলে দিতে পারেন সেটি কার, কেননা বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর দেহের গঠনপ্রকৃতি তাঁদের ভালো জানা আছে। যে-সমস্ত হাড়ের সন্ধান তাঁরা পান সেগুলি ঠিকঠিক জায়গায় জুড়ে দিয়ে তাঁরা নির্ভুলভাবে এমন জন্তুর চেহারা বলে দিতে পারেন যাকে এর আগে কেউ দেখে নি। এই জন্তু কোথায় বাস করত এবং সে কী করত, পুরাজীববিজ্ঞানীরা তা জানতে পারেন।

পুরাজীববিদ্যা কী কাজে লাগে?

প্রায়ই দেখা যায়, রূপকথার জীবজন্তু অলৌকিক গুপ্তধন কিংবা জিয়ন-বারির সন্ধান পেতে বীর নায়ককে সাহায্য করছে। 'পাথুরে পুথির' জন্তুজানোয়াররাও পাতালপুরীর ধনসম্পদের পথ দেখায়। এ পুথি যারা

পড়তে পারে না তাদের কাছে স্তরবদ্ধ পৃষ্ঠাগুলির একটির সঙ্গে অন্যটির কোন তফাত নেই। অনুমান করার সাধ্য কি কোথায় মানুষের প্রয়োজনীয় রত্নভাণ্ডারের খোঁজ করতে হবে!

কিন্তু পুরাজীববিজ্ঞানী প্রস্তরীভূত বৃক্ষপত্র আর শামুক-ঝিনুক ভালো করে দেখেশুনে বলে দেবেন: 'এখানে খোঁজ করা দরকার!' কেননা এক ধরনের জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায় কেবল পাথুরে কয়লার স্তরে, আরেক ধরনের — তেলের স্তরে।

আর সবচেয়ে বড় কথা, চিরকাল, সকলেরই জানার ইচ্ছে, আমাদের আগে কী ছিল। পৃথিবীটা কী রকম ছিল? কোন্ কোন্ জন্তুজানোয়ার সেখানে বিচরণ করত, তারা দেখতেই বা কেমন ছিল। এই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে থাকে পুরাজীববিদ্যা।

আরও একটি 'পাথুরে পৃষ্ঠা'। এর সন্ধান পেয়েছেন খনি-অনুসন্ধানকারীরা।

আমাদের বই সম্পর্কে

'পাথুরে পুথিতে' পুরাজীববিজ্ঞানীরা চারটি অধ্যায় পাঠ করেছেন। প্রথম অধ্যায় — 'উপরি' অধ্যায়। সেখান থেকে তাঁরা জানতে পারলেন নতুন জীবনপর্বের কথা, যখন পৃথিবীতে এমন সমস্ত জন্তুজানোয়ারের আবির্ভাব ঘটে যাদের বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করত। আজ যেসব জন্তু বেঁচে আছে তারা ছিল তাদের মতো।

এরই সামান্য নীচে দ্বিতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায় বিজ্ঞানীদের জানাল মধ্য জীবনপর্বের তথ্য, যখন পৃথিবীতে ছিল অতিকায় গিরগিটিদের রাজত্ব।

আরও নীচে, তৃতীয় অধ্যায়ে পুরাজীববিজ্ঞানীরা পড়লেন প্রাচীন জীবনপর্বের কাহিনী, যখন পৃথিবীতে কোন পশুপাখিই ছিল না, ছিল কেবল বিশাল বিশাল বেঙ, মাছ আর সামুদ্রিক কাঁকড়া-বিছে।

সবচেয়ে নীচের, চতুর্থ অধ্যায় থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন আদি জীবনপর্বের কাহিনী। পৃথিবী তখনও ছিল ফাঁকা, আর সমুদ্রে বাস করত এমন সমস্ত ছোট্ট ছোট স্বচ্ছ জীব যাদের খালি চোখে প্রায় দেখাই যেত না।

এই বইতে সেই একই ভাবে পরতে পরতে তোমাদের সামনে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে জন্তুজানোয়ার, গিরগিটি, পাখি আর গাছপালাদের, পরপর যেমন ভাবে তাদের বিবরণ পাওয়া গেছে 'পাথুরে পুথিতে'। আজকালের মতো দেখতে যে-সমস্ত জন্তুজানোয়ার এই কিছুকাল আগেও ছিল, তাদের সচিত্র কথা আছে শুরুতে, প্রাচীনতম জীবজন্তু আর গাছপালা আছে শেষে।

মনে হচ্ছে, প্রাচিন গিরগিটি যেন 'ধরা পড়েছে'।

কম্বল-গায়ে আফ্রিকা
২৫ হাজার বছর আগে

ঠান্ডা! দারুণ ঠান্ডা। চারধারে পেঁজা তুষার আর কঠিন বরফ। ইউক্রেনের স্তেপভূমির ওপর দিয়ে চলেছে কেবলই বরফের পাহাড়। চলেছে উত্তর গোলার্ধ থেকে আর ককেশাস পর্বতমালা থেকে। আর যে-সমস্ত জায়গায় বরফ নেই, সেখানে আছে উত্তুরে স্তেপভূমি। রোগা রোগা ফার ও দেবদারু গাছ, অবাড়ন্ত বেঁটে বেঁটে বার্চ গাছ আর এক রকমের ছোট ছোট গুল্ম ছড়িয়ে আছে মাটির ওপর। সেগুলির মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলছে হাতি আর গন্ডারের দল — ঠিক যেন আফ্রিকায়। তবে, এরা হল লোমশ। বড় বেশি রকমের লোমশ। কটা রঙের, কর্কশ পশম গোছায় গোছায় ঝুলে পড়ছে মাটি অবধি। এই লোমশ হাতির নাম **ম্যামথ**। ম্যামথ তার বড় বড় দাঁত দিয়ে বরফ খুঁড়ে খুঁড়ে গত বছরের পুরনো নলখাগড়া আর বার্চ গাছের ছোট ছোট ডালপালা খাচ্ছে। সে এই কঠিন খাদ্য ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাচ্ছে। ম্যামথের দাঁত মোটে চারটি, তবে তা হলে কী হবে, প্রতিটির আকার মানুষের মাথার সমান। আর কানজোড়া ছোট ছোট। হাতিদের যেমন হাতপাখার মতন কান থাকে তেমন কানে তার দরকার নেই — অমনিতেই যা ঠান্ডা!

খানিকটা দূরে চরে বেড়াচ্ছে গন্ডার। তারও গায়ে কম্বল। এর নামই তাই **পশমী গন্ডার**।

আর আছে এই লোমশ অতিকায়দেরই জুড়িদার — **বৃহৎশৃঙ্গ হরিণ**। সে সতর্ক দৃষ্টিতে চারধারে তাকাচ্ছে: সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র জানোয়ার — **গুহাবাসী সিংহটা** ধারেকাছে কোথাও নেই ত? বলা যায় না, এ ত প্রায় আফ্রিকা। কেবল কম্বল-গায়ে আফ্রিকা — এই যা।

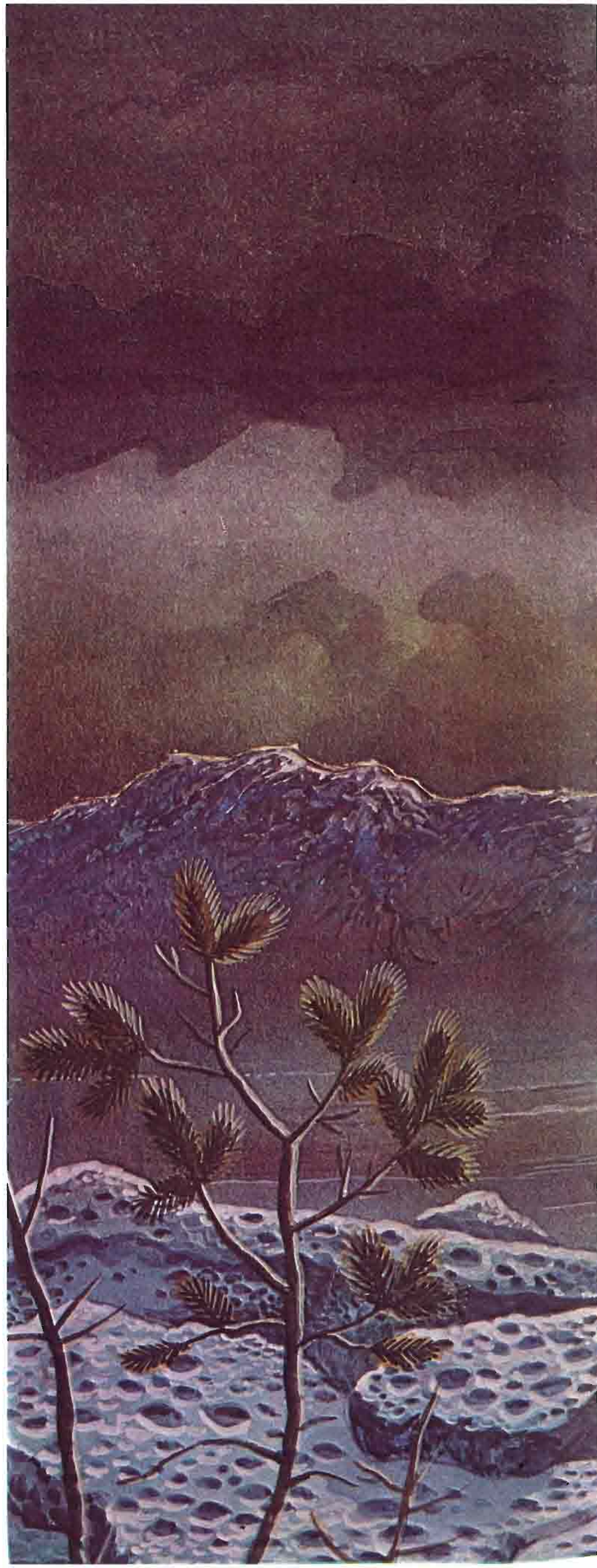

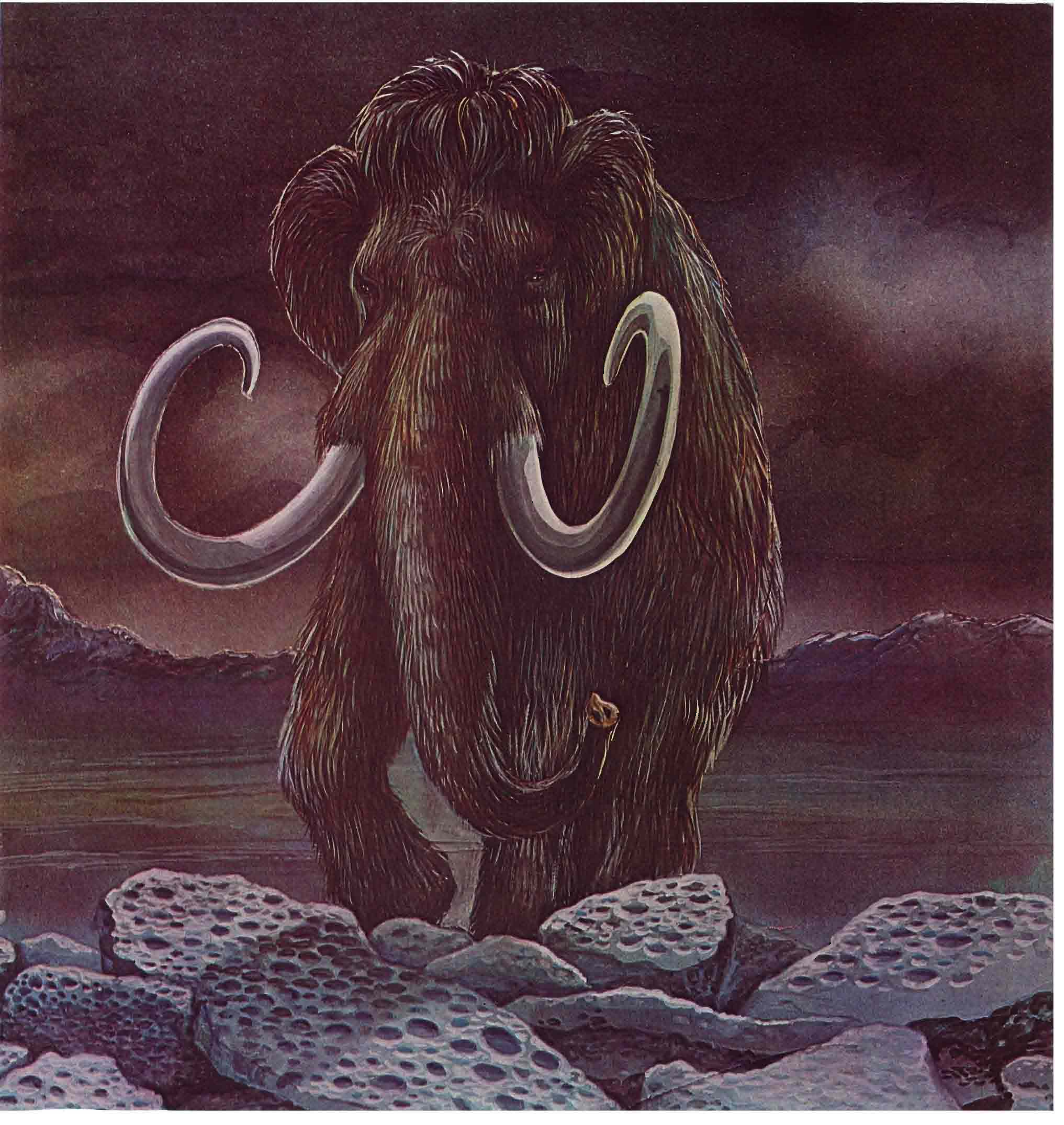

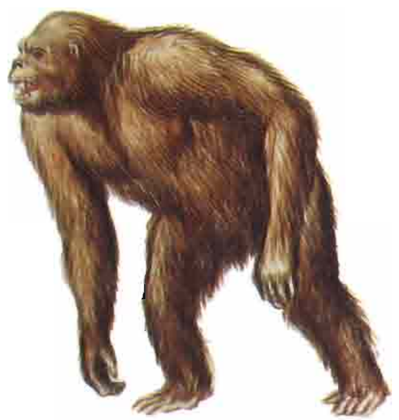

মেগালানথ্রোপ। বানরও নয়, মানুষও নয়। এই প্রাণীটির দারুণ শক্তি ছিল, সে কাউকে ভয় করত না।

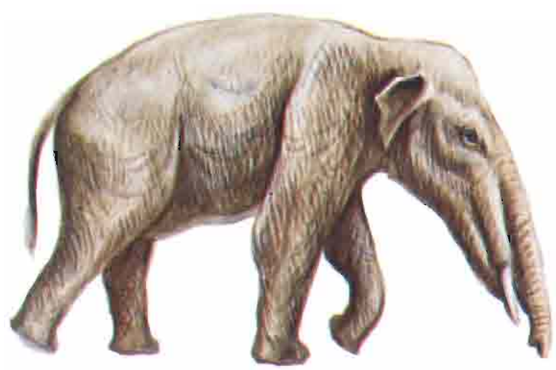

ম্যাস্টোডন্। হাতির দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। কুচকুচ করে ঘাসপাতা চিবুতে আর ঝোপঝাড় খেতে ভালোবাসত।

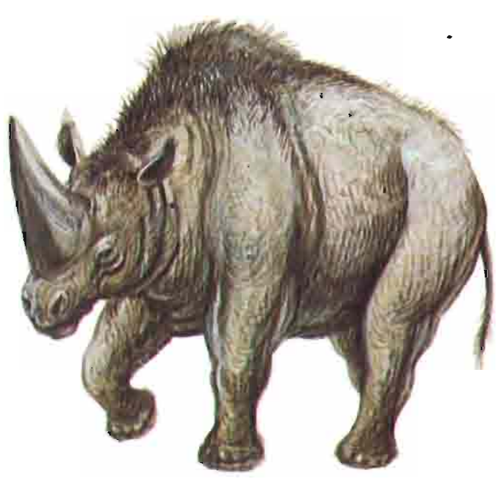

সেকালের গণ্ডার এলাসমোথিরিয়ম্ আকারে ছিল হাতির সমান।

যেখানে বরফ ছিল না
৫০ হাজার বছর আগে

আর যেখানে বরফ ছিল না, ছিল না হিমবাহ, যে-জায়গা ছিল ঈষদুষ্ণ, এমন কি গরমই, সেখানে বাস করত আশ্চর্য আশ্চর্য দৈত্যাকার জীবজন্তু। তাদের মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় হল **মেগালানথ্রোপ।** এই জীবটি না বানর, না মানুষ। মেগালানথ্রোপ হাঁটত দু পায়ে, কেবল দু হাতে আলতো করে মাটিতে ভর দিত। আকারে সে ছিল সবচেয়ে দীর্ঘকায় মানুষ আর সবচেয়ে বড় বানরের দ্বিগুণ উঁচু।

প্রচণ্ড শক্তিশালী জন্তু ছিল হাতির জ্ঞাতি — **ম্যাস্টোডন্** আর গণ্ডারের আত্মীয় **এলাসমোথিরিয়ম্।** এলাসমোথিরিয়মের কেবল একটা শিঙ্, তবে সেটা নাকের ওপর নয়, কপালে। এই জন্তুটা থামের মতো ভারী ভারী পা মাটিতে দাবিয়ে দিয়ে বুলডোজার যন্ত্রের ভঙ্গিতে গাছপালার শেকড় বাকড় উলটেপালটে বার করে ফেলে, কচমচ করে চিবিয়ে খেতে থাকে।

ঐ একই কালে আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান বনাঞ্চলে বাস করত **মেগাথিরিয়ম্** নামে বিশাল বিশাল শ্লথ। শ্লথ আজও সেখানে বাস করে, তবে আকারে ছোট, অনেকটা ছোট বানরের মতো। শ্লথ সারা দিন একটা ডালে ঝুলে থাকে, যতক্ষণ না ডালের সব পাতা খেয়ে শেষ করছে। না খিদে, না শত্রু — কারও তাড়নায়ই জায়গা থেকে সে একচুল নড়বে না — এমনই অলস। দৈত্যাকার শ্লথ আবার ছিল আরও অলস। ডালে ডালে ঘুরতে পর্যন্ত তার আলস্য। ইয়া বড় বড় নখওয়ালা থাবা দিয়ে গাছ ভেঙে ধীরেসুস্থে পাতা মুড়িয়ে খেয়ে ফেলত।

তারই পাশাপাশি বাস করত **গ্লিপ্টোডন্** — দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বর্মধারী জন্তু। জন্তুটা অনেকটা সজারু মতো দেখতে, তবে আকারে মানুষের চেয়ে বড়। কাঁটার বদলে তার পিঠে এক আঙ্গুল সমান পুরু হাড়ের বর্ম। এই জন্তু যখন গুটিসুটি মেরে বর্মে মোড়া কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে তখন তার সেই ভাঁজ খোলে সাধ্য কার!

বরফ আসার আগে...
১০ লক্ষ বছর আগে

জিরাফের আত্মীয় প্যালিওট্র্যাগাস।

বরফ আসার আগে গোটা পৃথিবীতে বেশ গরম ছিল। আজ যেখানে তাইগা, সেখানে ছিল সতেজ বীচ গাছের জঙ্গল, যেমন আছে ককেশাসে। পাখিরা গান গাইত, ঘুর্ঘুরে পোকারা ঝিঁঝিঁ আওয়াজ করত আর বাস করত যত রাজ্যের মজার মজার জন্তুজানোয়ার: ঘোড়া, অথচ ঘোড়া নয়, জিরাফ, অথচ জিরাফ নয়। কারও ঘাড়টা ঘোড়ার মতো, কিন্তু মাথায় দুটি শিঙ্। কারও বা কান গাধার মতো, কিন্তু পা জেব্রাদের মতো ডোরাকাটা।

এরা হল **প্যালিওট্র্যাগাস** — এখনকার কালে চাকা চাকা দাগ ধরা লম্বা ঘাড়ওয়ালা যে-জিরাফদের আমরা দেখতে পাই, তাদেরই দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। সকলেই জানে যে জিরাফের বাস আফ্রিকায়। কিন্তু প্যালিওট্র্যাগাসদের বাস ছিল আমাদের দেশের স্তেপ অঞ্চলে।

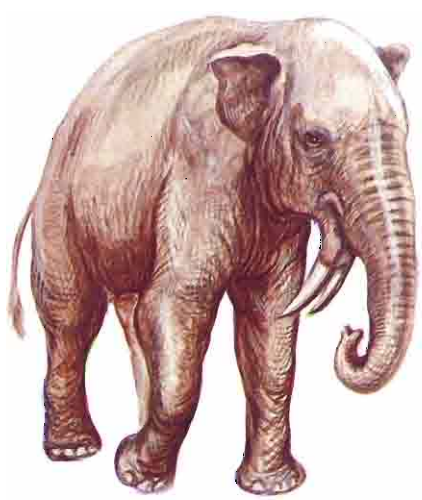

প্রাচীন কালের দৈত্যাকার হাতি ডাইনোথিরিয়মের দাঁত অবিকল সিন্ধুঘোটকের দাঁতের মতো।

হাতির আত্মীয় **ডাইনোথিরিয়মকে** দেখা যাচ্ছে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে। ডাইনোথিরিয়মের অর্থ হল 'আশ্চর্য জন্তু'। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু তার মধ্যে নেই। নিছকই হাতি। কেবল সুবিশাল, আর দাঁতজোড়া নীচের দিকে খাড়া হয়ে আছে, যেমন হয় সিন্ধুঘোটকের দাঁত।

প্রাচীন জন্তুজানোয়ারদের আতঙ্ক, ডাকাতে **তলোয়ারদন্তী** তার শিকারকে মাটিতে চেপটে ফেলল। চোখজোড়া ধকধক করছে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট কান দুটোয় চাপ পড়েছে, দাঁত খিঁচিয়ে আছে। তলোয়ারের মতো তার কষের দাঁতের কাছে কারও নিস্তার নেই।

দেখতে দেখতে জন্তুটা শান্ত হয়ে এলো, ঠোঁট চাটল। নিঃশব্দে কষের দাঁতগুলি খাপের ভেতরে লুকিয়ে ফেলল। চিবুকের এই খাপগুলি তলোয়ারদন্তীর দরকার হয়, যাতে ঘন বনজঙ্গলের ভেতরে তার কষের তলোয়ারদাঁত ভোঁতা না হয়ে যায়।

আত্মীয় হলেও মিল নেই
৩ কোটি বছর আগে

রুশদেশের প্রাচীন বীরগাথায় ইন্দ্রিক নামে এক রকম জন্তুর কথা আছে। এই জন্তু এত বিরাট ছিল যে নদীর স্রোত আটকে দিতে পারত, পাহাড়-পর্বত সরিয়ে দিতে পারত। এই কারণে বিজ্ঞানীরা যখন মাটির নীচে সবচেয়ে বিশালকায় গণ্ডারের হাড়গোড়ের সন্ধান পেলেন তখন তাঁরা তার নাম দিলেন **ইন্দ্রিকোথিরিয়ম্‌**। একটা জলহস্তী অনায়াসে তার পেটের তলা দিয়ে গলে যেতে পারত।

ইন্দ্রিকোথিরিয়ম্‌ যদিও গণ্ডার কিন্তু চেহারায় এবং আচার-আচরণে সে রীতিমতো জিরাফ। গাছপালার সারির মাঝখান দিয়ে সে চলত আর ডালপালার চারপাশের পাতা খেত। মোটেই গণ্ডারের মতো নয়!

লম্বা লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা বুনো শুয়োর **এণ্টেলোডনের** ধরনধারণ জলহস্তীর মতো। নদীর স্রোত যেখানে বন্ধ হয়ে গেছে, সারাটা দিন সে সেখানকার জলে দাপাদাপি করে আর রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় সাভানা তৃণভূমিতে। লোমশ, দাঁতাল পশুটা যা পায় তা-ই গেলে: রসাল শেকড়বাকড়, পাখির ডিম, মায় সাপ।

আবার আরেক রকমের হাতি ছিল — তাদেরও হাতির চেয়ে বেশি মিল জলহস্তীর সঙ্গে। এই হাতি মাটি-তোলা কোদালের আকারে মুখ খুলে হাঁ করে, জল থেকে গাছগাছড়া ছেঁচে তুলে খায়। আর চেটাল গজদন্ত দিয়ে সে শেকড়বাকড় বাগে আনে। এই ধরনের হাতির নাম **প্ল্যাটিবেলোডন,** যার অর্থ হল 'চেটাল দেঁতো'।

সেকালের শুয়োর এণ্টেলোডন আকারে একটা ষাঁড়ের সমান, কিন্তু ইন্দ্রিকোথিরিয়মের পাশে তাকে নেহাৎই ছোটখাটো দেখায়।

সেকালের ঘোড়া এওহিপ্পো আকারে খেঁকশিয়ালীর চেয়ে বড় হত না। এর সামনের দু পায়ে ছিল চারটে করে আঙুল আর পেছনের দুপায়ে — তিনটে করে।

এণ্ড্রুসার্কুস একই সঙ্গে যেমন হায়েনার মতো, তেমনি আবার ভালুকের মতোও দেখতে বটে।

কাঁটাচুয়াকুলের ঠাকুর্দা সেভ্‌ডিকটোপ্‌সের গায়ে কাঁটা ছিল না, সে তখনও গোল হয়ে গুটিসুটি পাকিয়ে যেতে পারত না।

প্রাচীন স্তেপের ছায়া
৬ কোটি বছর আগে

রাতের স্তেপে হুড়মুড় দুড়দাড় আওয়াজ। চাঁদের আলোর মিহি ফুরফুরে জাল ছিঁড়েখুঁড়ে দূরে কোথায় যেন ছুটে চলেছে বেঢপ কতকগুলি ছায়ামূর্তি।

কী ব্যাপার?

ধস নামল নাকি?

ভূমিকম্প?

না। কে যেন 'বাজখাঁই জন্তু' **ব্রণ্টোথিরিয়মদের** পালকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

একটা ফ্যাঁসফেঁসে টানা টানা গর্জন — চাঁদের আলোয় ঝলক দিয়ে উঠল কার যেন উস্কখুস্কো শরীর। চোখ দুটোতে ধকধক করে জ্বলছে ভয়ঙ্কর আগুন। আলোয় ঝকমক করে উঠল দাঁতের পাটি আর আকাশজোড়া প্রকাণ্ড হাঁ — দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। শিকারে বেরিয়েছে রাতের আতঙ্ক **এণ্ড্রুসার্কুস।**

সট করে একপাশে সরে গিয়ে মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে পড়ে রইল ধেড়ে ইঁদুরের মতো দেখতে একটা ছোট জন্তু। কাঁটাচুয়াকুলের ঠাকুর্দা **সেভ্‌ডিকটোপ্‌স** রাতের স্তেপে ভয়ে মরছে। তার কারণ হল তখনও তার শরীরে কাঁটা দেখা দেয় নি।

আর সব যখন থিতিয়ে শান্ত হয়ে এলো, তখন চারপাশে যেন ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল চাঁদের এককেকটি কণা। খেলায় মেতে উঠেছে সেকালের খুদে ঘোড়ারা। এরা আকারে খেঁকশিয়ালীর চেয়ে বড় নয়। এদের নাম **এওহিপ্পো।** লম্বা লম্বা ঘাসের ওপরে নিঃশব্দে পড়ছে তাদের ছোট্ট ছোট্ট পা। তাদের পায়ে তিনটে করে খুরওয়ালা আঙুল। শূন্যে ঝলক মারছে ছিপছিপে লেজ, লেজের ডগায় চুলের গোছা।

সত্যিকারের ঘোড়া হয়ে ওঠার মতো বড় হতে এবং দৌড়ানো শিখতে তাদের আরও অনেক অনেক সময় লাগবে।

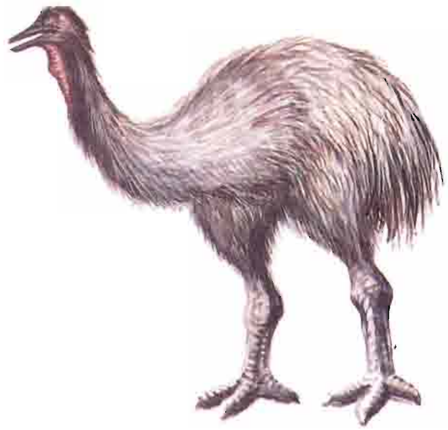

ইপিওর্নিস পাখি বাড়ির দোতলার জানলায় উঁকি মারতে পারত। ৫০ হাজার বছর আগে এই পাখি পৃথিবীতে ছিল।

মোয়া পাখির বাসভূমি ছিল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অরণ্য। দু শ বছর আগে মানুষ একে ধ্বংস করে।

দৈত্যাকার পাখি
সাড়ে তিন কোটি বছর আগে

নবজীবন সৃষ্টির যুগে ছোট-বড় নানা রকমের হাজার হাজার পাখি পৃথিবীতে বসবাস করত। তাদের মধ্যে সত্যিকারের দৈত্যাকার পাখিরাও ছিল। তারা দেখতে ছিল অনেকটা উটপাখিদের মতো। কিন্তু এই পাখিগুলির যে কোন একটির সামনে উটপাখিকে বামন বলে মনে হবে। এরা সকলেই যে উড়তে পারত তা নয়, তবে জোর দৌড়ুতে পারত।

আজও মাডাগাস্কার দ্বীপে বাদা অঞ্চলের জলামাটির নীচে **ইপিওর্নিস** পাখিদের ডিম দেখতে পাওয়া যায়। এই ডিম ফুটে যে-বাচ্চা বেরোত তার আকার হত একটা মুরগীর সমান। আর বয়স্ক ইপিওর্নিস বাড়ির দোতলার জানলায় উঁকি দিতে পারত। ইপিওর্নিসের মতোই দেখতে **মোয়া** পাখি বাস করত নিউ জিল্যান্ডের বনে। এই দু জাতের পাখিই ছিল নিরীহ স্বভাবের, কারও কোন ক্ষতি তারা করত না।

জল্লাদ পাখি

ফোরোরাকোস পাখিও বাড়ির দোতলার জানলায় উঁকি দিতে পারত। এর মাথাটা ঘোড়ার মাথার চেয়েও বড়। ঠোঁট — জল্লাদের কুড়ুলের মতো। রক্তপিপাসু পাখিটা কাচের মতো চকচকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোন জন্তু তার সামনে পড়ে একটু থতমত খেয়ে গেলেই হল — তাকে সে খন্ডখন্ড করে কেটে ফেলবে। দেখতে দেখতে বীভৎস ভোজের ওপর নিঃশব্দে উড়ে আসতে থাকে কালো কালো শকুনের দল। শিরা-ওঠা পা ফেলে ফেলে ছুটে আসে আরেক শিকারী পাখি — **ডায়াট্রিমা;** সেও দৈত্যাকার পাখিটার চারধারে ঘুরঘুর করতে থাকে। একটা লোভনীয় টুকরো যদি কোন রকমে মিলে যায়।

আচ্ছা সত্যিই বল ত ফোরোরাকোসকে দেখে কি ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারবে যে এই ভয়ঙ্কর জল্লাদটা — আমাদের বড় আদরের, সুশ্রী পাখি সারসদের আত্মীয়!

অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝখানে
৭ কোটি বছর আগে

ছটফটে ছোট ছোট জন্তুগুলি সরসর আওয়াজ করছে, হুটোপুটি খাচ্ছে, এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তাদের লম্বা লম্বা নাক অনবরত নড়ছে আর ধারাল দাঁত দিয়ে তারা সামনে যা পড়ছে তা-ই চিবুচ্ছে। দেখতে দেখতে ওরা কান খাড়া করল, মুখ নাড়ানো বন্ধ করে দিল, তাদের দৃষ্টি একটা বিন্দুতে এসে ঠেকল। আরও এক মুহূর্ত — জন্তুগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর যেখানে এই মাত্র ছোটরা ছুটোছুটি করছিল সেখানে অনড় ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়ে রইল কদাকার, কুৎসিত চেহারার এক অতিকায় প্রাণী। সূর্য পাটে গেল। মাটির ওপর এসে পড়ল দীর্ঘ কালো ছায়া। উপহ্রদের তীরে শৈলমালা আর পাথর হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর লাল। লাল আলোর কিরণ দানবটার চোখে এসে ঠিকরে পড়ল। মরা গাছের শাখাপ্রশাখার মতো বিশাল বিশাল থাবাগুলি প্রাণ ফিরে পেল, নড়েচড়ে উঠল। কর্কশ, করুণ, নিঃসঙ্গ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডাক জলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, স্বচ্ছ সন্ধ্যার নীরবতার মধ্যে চুপ করে গেল। সে ডাকে কেউ সাড়া দিল না, কেউ এলো না। কেবল ছোট ছোট ছটফটে জন্তুগুলি পাথরের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে আবার আগের মতো ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। নিঃসঙ্গ গিরগিটিটার দিকে নজর দেবার মতো সময় ওদের নেই। এই গিরগিটিটা রোজ সূর্যাস্তের সময় এখানে আসে, ডাক ছাড়ে, বৃথাই অপেক্ষা করে জবাবের। ছোট জন্তুজানোয়াররা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, যেমন তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে খসখসে পাথরে আর শেওলার গন্ধে।

মহাকায়ও ছোটদের দিকে নজর দেয় না। কী করেই বা সে আঁচ করবে যে তার দিনকাল চলে গেছে এবং তার পায়ের কাছে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে হাতি, গণ্ডার ও তিমিদের পূর্বপুরুষরা, আর দীর্ঘ হাজার হাজার বছরের জন্য এরাই হবে পৃথিবীর প্রভু!

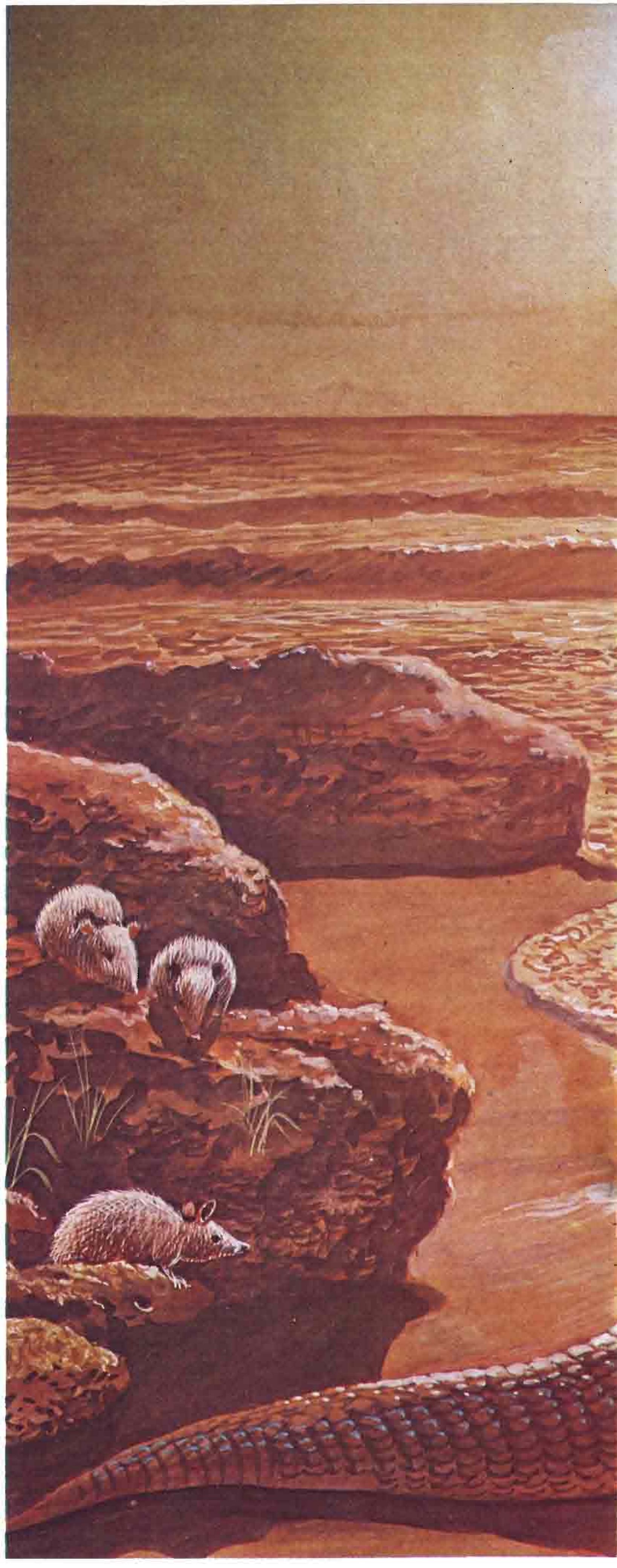

ট্রাইসিরেটপ্স গিরগিটি আকারে ষাঁড়ের সমান। সে রীতিমতো সশস্ত্র, আত্মরক্ষায় সমর্থ। এই গিরগিটিদের মাথার খুলিতে প্রাচীন কালে সংঘর্ষের ফলে প্রাপ্ত আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।

খুদে প্রোটোসিরেটপ্স ছিল শিঙওয়ালা ট্রাইসিরেটপ্সের ঠাকুর্দা। কেবল হাড়ের শিরস্ত্রাণ তাকে হিংস্র জন্তুদের খপ্পর থেকে বাঁচাত। অন্যান্য ডাইনোসরদের মতো এই জন্তুটিও বালির ভেতরে, অগভীর গর্তে ডিম পাড়ত।

জীবনসৃষ্টির মধ্য কাল
৭-১৪ কোটি বছর আগে

ঐকালে মানুষের কাছে পৃথিবী হয়ত বিরূপ আর ভয়াল বলেই মনে হত। বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় ফুল জন্মাত না, ঘাসও জন্মাত না। সেখানে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি পাখা মেলে উড়ত না। অদ্ভুত দাঁতাল পাখিরা গান গাইত না, কিচিরমিচির করত না, তারা হিসহিস আর ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্ আওয়াজ করত। অনেক উঁচুতে মাথার ওপর দোল খেত গাছের মতো দেখতে এক জাতীয় ফার্ন গাছের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা। আর দেবদারুজাতীয় গাছে খসখস আওয়াজ তুলত চামড়ার মতো দেখতে, চওড়া চওড়া পাতা।

চারপাশে গিরগিটি আর গিরগিটি। জলে স্থলে আকাশে — যেদিকেই চাও না কেন। ছোট আর বড়, নিরীহ আর হিংস্র, ধীরগামী ও দ্রুতগামী। কারও গায়ে শুধু চামড়ার আবরণ, কারও বা গা লোমে ঢাকা। কোন কোন গিরগিটির দুটি পা, কোনটার বা চারটি। কোন কোন গিরগিটির পায়ের বদলে পাখনা। গিরগিটিরা পৃথিবীর প্রভু।

ডুবুরি গিরগিটি
৮ কোটি বছর আগে

হংসচঞ্চু গিরগিটি — সাউরলোফ ছিল নিরীহ স্বভাবের তৃণভোজী প্রাণী। হিংস্র প্রাণীদের সে ভয় পেত না, কেননা তাদের থেকে সব সময় প্রাণ বাঁচাতে পারত জলে গিয়ে। আকারে সে ছিল দোতলাসমান আর মাথায় উঁচু ঝুঁটি থাকাতে তাকে আরও উঁচু দেখাত। ডুবুরি গিরগিটি ভালো সাঁতার কাটতে পারত এবং নানা রকম জলজ উদ্ভিদ খেত। সে তার ঠোঁট দিয়ে জলের নীচে শক্ত শেকড়বাকড় ধরে টানাটানি করত, আর সেই সময় জলের ওপরে জেগে থাকত একমাত্র তার ঝুঁটি। ডুবুরি গিরগিটির কোন তাড়াহুড়ো নেই, দম আটকানোর ভয় তার নেই। ঝুঁটির ভেতর দিয়ে দুটি নল সোজা চলে গেছে নাকে। ঐ নলের সাহায্যেই নিশ্বাস নেয় গিরগিটি। সহজ ব্যাপার, আরামের বটে!

স্বৈরাচারী গিরগিটি
৮ কোটি বছর আগে

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী গিরগিটি ছিল **ডাইনোসর,** যার অর্থ 'ভয়ঙ্কর গিরগিটি'। আবার ডাইনোসরদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও রক্ত লোলুপ ছিল **টাইরানোসর** — ডাকাতে গিরগিটি।

টাইরানোসর ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায়। ভয়ানক ড্র্যাগন -- ছোট ছোট হাত তার। ছুরির ফলার মতো ঝকঝক করছে দাঁত। ড্র্যাগনটা তার লম্বা মাংসল লেজ মাটিতে আছড়াচ্ছে। শক্তিশালী নখরের আঘাতে মাটিতে পড়ছে যেন লাঙলের গভীর আঁচড়। হিস হিস আওয়াজ আর আর্ত চিৎকার কাঁপিয়ে তুলল তপ্ত আকাশ-বাতাস। ডাকাতে গিরগিটি ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর।

কিন্তু না, এ বড় কঠিন ঠাঁই। দেবদারু গাছের শীষের মতো গড়নের, তবে সুবিশাল জন্তু — **আঙ্কিলোসর** মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে পড়ে রইল, খাড়া হয়ে উঠল তার হাড়ের মতো কঠিন আঁশগুলি। তার লেজের শেষ দিকটা যেন এক কাঁটাওয়ালা মুগুর। ওটা এখন বেঁকে গেল, বাতাস কেটে সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে ক্ষিপ্তভাবে বনবন করে পাক খেতে লাগল। চারপাশে গড়ে উঠছে একটা মারাত্মক চক্র আর সেই সঙ্গে চলছে গোঁ গোঁ শব্দ।

আক্রমণকারী হিংস্র জানোয়ারটা তড়াক করে লাফিয়ে এক পাশে সরে গেল, কিন্তু আঙ্কিলোসর আবার তার দিকে লেজ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। একবার কাছে আসার চেষ্টা করেই দ্যাখ্ না!

পিক্‌নোডন মাছ শামুকজাতীয় প্রাণী খেত, আর নিজে সে প্রায়ই সামুদ্রিক গিরগিটি ও পাখিদের খাদ্য হত।

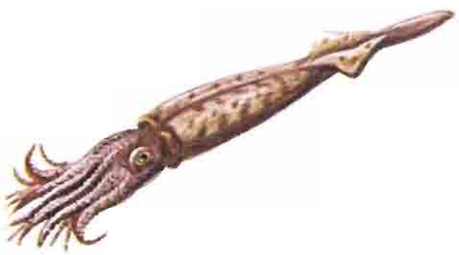

বেলেম্‌নাইটরা প্রবালের অপূর্ব বাসাগুলির উপর টর্পেডোর মতো ধেয়ে আসত।

লরির চাকার মতো বিশাল শামুকের খোলের ভেতরে জবুথবু ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী কাট্‌ল মাছকে বসিয়ে দিলে যেমন হয় অ্যামোনাইট দেখতে ছিল সেই রকম।

পাখি আর গিরগিটি
১২ কোটি বছর আগে

উপসাগরের ওপর ধকধক করছে অসহ্য গরমের হলকা। এক ফোঁটা হাওয়া নেই। কিন্তু সমুদ্রের ঘুম নেই। মহাসাগর থেকে গড়িয়ে আসছে সবুজ রঙের মৃদুমন্দ ঢেউ, হিস হিস শব্দে নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এসে চলে পড়ছে উপকূলের গনগনে পাথরের গায়ে।

ঢেউয়ের আঘাতে যে-সাদা ফেনা সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে ঝলক মারল একটা কালো রঙের লম্বা মাথা। ধারাল দাঁতের ফাঁকে ছটফট করছে **পিক্‌নোডন** নামে এক বিরাট মাছ। জল দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে করে পেছন দিকে গড়িয়ে গেল, সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল রামধনুরঙা ফেনার বুদ্বুদ। আর ডানাহীন বিশাল পাখিটা পাতলা চামড়ায় জোড়া আঙুল সমেত লাল রঙের থাবায় কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রাণপণশক্তিতে চলতে লাগল।

দুর্ভাগ্যবশত, থপথপ করে বাসার দিকে চলার সময় **হেস্পারোরনিস** নামে এই কদাকার মৎস্যশিকারী পাখিটা ছোট ছোট দাঁতাল শঙ্খচিলদের — **ইকথিয়োরনিসদের** ঝাঁকের শান্তিভঙ্গ করল। হিসহিস, গ্যাঙর গ্যাঙর ডাক আর চোয়াল নাড়ানোর ঠকঠক আওয়াজে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

এমন সময় একটা নিঃশব্দ কালো ছায়া এসে ভীতসন্ত্রস্ত ঝাঁকটাকে যেন মাটির সঙ্গে চেপে ধরল। জমকাল ভঙ্গিতে বিপুল ডানা ঝাপ্‌টে আকাশে ভেসে চলেছে উড়ুক্কু গিরগিটি **টেরানোডন**। তার পাতলা চামড়ার পরত-দেওয়া ডানার নীচে অনায়াসে গোটা কয়েক হাতির স্থান হতে পারে। কিন্তু আকাশের একছত্র অধিপতিটি নীচের দিকে তাকাল না। সে উড়ে চলছিল সাগরের দিকে। সেখানে গরম ধোঁয়ার ভেতরে এঁকেবেঁকে দুলছিল সামুদ্রিক গিরগিটি **প্লেসিয়োসরদের** সাপের মতো গলা।

বেলেম্‌নাইট শিকার শুরু হয়ে গেল। তারা বড় বড় ঝাঁক বেঁধে উপসাগরে এসে পড়ছিল।

গিরগিটি-জলদস্যু
১০ কোটি বছর আগে

বিশাল সামুদ্রিক কচ্ছপ **আর্কেলন** মরিয়া হয়ে তার পাখনা ঝাপটে চলেছে। তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান — এখান থেকে পালানো, কোথাও লুকিয়ে পড়া, প্রাণ বাঁচানো। এমন একটা উজ্জ্বল, রোদে ঝলমল দিনে হাঙ্গরের পেটে যেতে কারই বা সাধ হয়! কচ্ছপ কখনও প্রবালের উজ্জ্বল ঝাড়ের ওপর দিয়ে বেগে সাঁতার দেয়, সাগরের একেবারে তলায় গিয়ে ঘাপটি মারে, কখনও বা জলের ওপরে ভেসে উঠতে গিয়ে জেলিমাছের থলথলে পিন্ডের সঙ্গে ধাক্কা খায়। কিন্তু সবই বৃথা। বিকট হাঙ্গরটা সামনে এগিয়ে এলো। আর কয়েকটি মুহূর্ত — তার পরই সব শেষ। কিন্তু এমন সময় জলের মধ্যে খেলে গেল একটা ঘূর্ণি, আর সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে কচ্ছপটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে শুরু করল। স্রোতের উজান বয়ে কোথা থেকে যেন কালো বিদ্যুতের মতো ছুটে বেরিয়ে এলো একটা বিশাল দেহ। গুহার মতো প্রকান্ড দাঁতাল মুখগহ্বর খুলে যেতেই চক্ষের পলকে হাঙ্গরের ধড়টা তার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল তখনও সে ক্ষিপ্ত হয়ে লেজ আছড়ে জল তোলপাড় করে চলেছে। সামুদ্রিক গিরগিটি **মোসাসরস** আকস্মিকভাবে কচ্ছপের উদ্ধারকর্তা হয়ে দেখা দিয়েছে। এদিকে কচ্ছপের তখন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। সে তার শেষ শক্তি সঞ্চয় করে ছুটে গেল জলের ওপরের দিকে, যেখানে শুশুকের মতো দেখতে মাছ-গিরগিটিরা মহা ফুর্তিতে ডিগবাজি খেয়েছিল। কচ্ছপ পালিয়েছে মোক্ষম সময়ে; কেননা মোসাসরস ইতিমধ্যে হাঙ্গরকে সাবাড় করার পর প্রবালের ঝোপঝাড়ের ভেতরে নতুন শিকারের সন্ধান করছিল।

পৃথিবীর আদিমতম পাখি আর্কিঅপ্টেরিক্স ভালোমতো উড়তে না পারলে কী হবে, হামাগুড়ি দিয়ে চটপট গাছে চড়তে পারত, দৌড়ুতেও পারত।

লোমশ গিরগিটি টেরোড্যাক্টাইল আকারে কাকের চেয়ে বড় ছিল না।

দাঁতাল গিরগিটি রামফোরিংক্সের মৎস্য ভোজনে বেশ উৎসাহ আছে, আবার বাগে পেলে ফড়িং গিলতেও তার আপত্তি নেই।

সেকালের বনছায়াতলে
১০ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে

পৃথিবীতে প্রকান্ড প্রকান্ড যত গিরগিটির আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে একটি হল **ডিপ্লোডোকাস**। আজকের দিনে এই রকম দৈত্যাকার জীব যদি আমাদের বড় রাস্তায় এসে উপস্থিত হত তা হলে এ ফুটপাথ থেকে ও ফুটপাথ — গোটা রাস্তা আটকে ফেলত। ডিপ্লোডোকাস সারাদিন জলা জায়গায় ঘুরে বেড়াত আর খেত, খেত সে সমানে। সাপের মতো লম্বা ঘাড়ের ওপর ছোট মাথাটা কখনও সে বাড়িয়ে দিত গাছপালার উ'চু মাথার দিকে, কখনও বা ডুবিয়ে দিত গভীর জলের ভেতরে। এই বিশাল বপুকে খাইয়ে-দাইয়ে টিকিয়ে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

স্টিগোসরস গিরগিটিও অনবরত কিছু না কিছু চিবুত। কিন্তু ডিপ্লোডোকাসের মতো এমন বিরাট বপু তার পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। এই জন্তুর বাস ছিল উপকূল অঞ্চলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে। সাঁতার কাটতে সে ভালোবাসত না। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না। এই কারণে স্টিগোসরসকে নির্ভরযোগ্য অস্ত্রে সজ্জিত হতে হয়। তার লেজে চারটে ধারাল কাঁটা, ছুঁচের মতো খাড়া হয়ে আছে। পিঠের ওপর দুই সারি হাড়ের অদ্ভুত গাঁথুনি দেওয়া পাত। স্টিগোসরস ভয়ঙ্কর হিসহিস শব্দ করে, পাতের পাখনা দিয়ে কড়কড় আওয়াজ বার করে, তার মারাত্মক অস্ত্র — লেজের ঝাপট মারে। শত্রু আতঙ্কে কে'পে ওঠে, পিছিয়ে যায়, মানে মানে কেটে পড়ে। এদিকে গোলমাল শুনে পাতলা চামড়ার পরত-দেওয়া ডানা মেলে উড়তে থাকে লোমশ গিরগিটির দল। কিন্তু স্টিগোসরসকে দাঁতে কাটার সাধ্যি তাদের নেই, কেননা তারা নিজেরাই আকারে বাজপাখির চেয়ে বড় নয়। গলা ফুলিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজে আর আর্ত চিৎকারে তারা সচকিত করে তোলে খেলনার আকারের এক ধরনের উজ্জ্বল পাখিকে। একটা গাছের কান্ডে পাখিটা তার দাঁতাল ঠোঁটে কালো রঙের এক পোকা চেপে ধরে ঠায় বসে রইল। পৃথিবীর আদিমতম পাখি **আর্কিঅপ্টেরিক্স** আকারে ছিল পায়রার সমান। সে বিপজ্জনক পড়শীদের কাছ থেকে তফাতে থাকত।

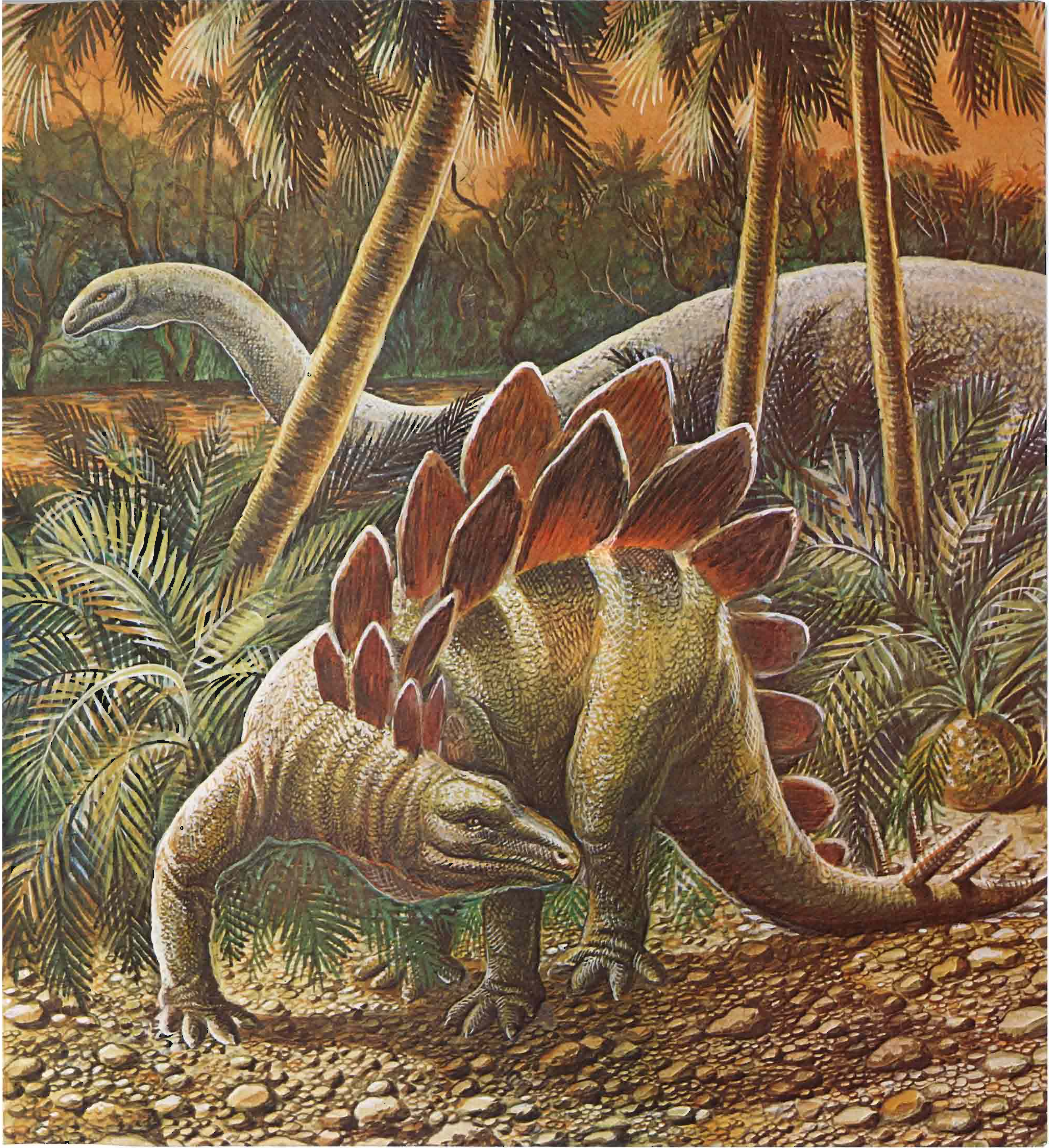

জীবনসৃষ্টির প্রাচীন কাল
২২-৫৭ কোটি বছর আগে

সেই সুদূর অতীতে পৃথিবীতে যে সব সময়ই গরম হত এমন নয়। দক্ষিণ ও উত্তর মেরু থেকে বিশাল বিশাল হিমবাহ এগিয়ে আসার ঘটনাও ঘটত। প্রাচীন গিরগিটিদের বাসস্থান অবধি হিমবাহের কনকনে নিশ্বাস এসে পড়ত। এই কারণে **এডাফোসরস** গিরগিটি সব সময় শরীর গরম করার ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে বেড়াত। তার পিঠের ওপর থাকত হাড়ের ঠেকায় খাড়া করা, পালের মতো উঁচু একটা ঝুঁটি। সূর্য একটু উঁকি মারলেই এডাফোসরস্ তার চওড়া ঝুঁটিটাকে সূর্যকিরণের নীচে রাখত। ঝুঁটি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উঠত, গিরগিটির সর্ব শরীরে বয়ে যেত উত্তাপ।

আর হিংস্র জানোয়ার **ইনস্ট্রান্‌সেভিয়া** চলতে চলতে শরীর গরম করে। নেকড়ের মতো পা-ই হল তার জীবনধারণের উপায়। সে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটোছুটি করে, উপকূলের ঝোপঝাড়ে ঘুরঘুর করে, খুঁজে দেখে কোথায় চরে বেড়াচ্ছে গালফোলা, কদাকার গিরগিটি — **পারেইয়াসরসের দল**।

গেঁতো স্বভাবের পারেইয়াসরসরা অমনিতে দেখতে ভয়ঙ্কর হলে কী হবে, আসলে তারা একেবারেই অসহায়। ছোট ছোট বাঁকা বাঁকা পায়ে চটপটে হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের কাছ থেকে ছুটে পালান সম্ভব নয়। তবে সেই পায়ের নখ দিয়ে পলিমাটি কোদাল-চাঁছা করে তোলা যায়। আস্ত একটা গোরুর আকারের এ ধরনের গিরগিটি থকথকে কাদামাটির ভেতরে গর্ত খুঁড়ে এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে যে দাঁতাল ইনস্ট্রান্‌সেভিয়ার সাধ্য কি তাকে খুঁজে পায়!

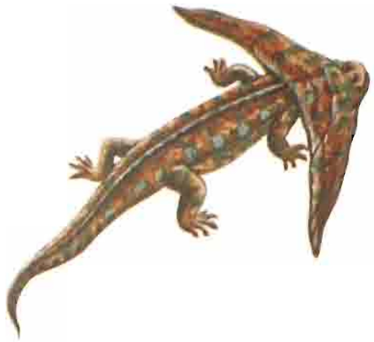

স্টিগোসেফাল্ ডিপ্লোকটোস — সামুদ্রিক জাহাজের নোঙ্গরের মতো দেখতে।

খুদে জাতের স্টিগোসেফাল্ ব্রংখিসরস্ পোকামাকড় ধরে খেত, জলায় বাস করত, পাড়ে প্রায় উঠত না বললেই চলে।

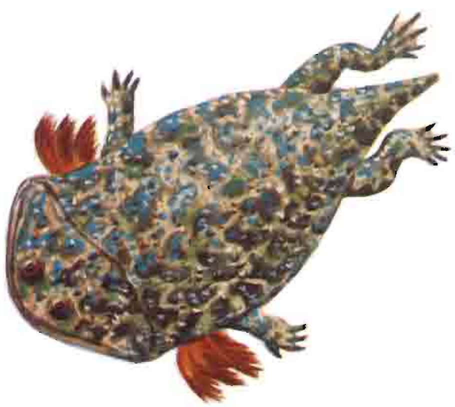

আজকালকার দিনের বাতাসে ফোলানো গদির মতো চ্যাপ্টা স্টিগোসেফাল্ প্ল্যাগিয়োসরস্ লাল রঙের ফুলকো ফুলিয়ে দিয়ে শিকারের জন্য ওত পেতে থাকত। সে জল থেকে কখনও উঠত না।

বেঙ রাজকুমারী
৩০ কোটি বছর আগে

বন জলে ভিজে স্পঞ্জের মতো হয়ে আছে।

ধারাস্রোতে জল বয়ে চলেছে গাছের কান্ডের আঁশ-আঁশ গায়ের ওপর দিয়ে, পালক-আকারের জমকাল ডালপালা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। শূন্যে ভাসছে গোলাপী মেঘ।

কোন কোন গাছ কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে আছে, কোন কোনটা শেকড়ের উঁচু উঁচু রণপার ওপর ভর দিয়ে জল থেকে ওপরে উঠে আসার চেষ্টা করছে। অদ্ভুত বন। অদ্ভুত গাছপালা। যেন কোন এক যাদুকর তামাসা করার জন্য জলাভূমিতে উঁচু উঁচু ঢিবি আর সেখানকার বাসিন্দাদের সংখ্যা হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

জলাভূমির অশ্বপুচ্ছ গাছ বার্চ গাছের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। হাতিশুঁড় গাছকে এখন ঘাসের ভেতরে চট করে নজরেই আসে না, অথচ তখন তা একশ বছরের দেবদারু সমান উঁচু হত। এক মিটার লম্বা ডানা মেলে হেলিকপ্টারের মতো গোঁ গোঁ করে উঠল মহাকায় ফড়িং, এসে নামল জলের ওপর। বাছুরের সমান আয়তনের একটা বেঙ জল থেকে টেবিলের মতো চওড়া মাথা বার করল, সঙ্গে সঙ্গে আসুরিক গ্যাঙর গ্যাঙরে বন গম গম করে উঠল। আজকের বেঙ আর ট্রাইটনদের অসংখ্য পূর্বপুরুষ প্রাচীন জীবনসৃষ্টি কালের বনের ভেতরে জলে সাঁতার কাটছে, মাটিতে থপথপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রোদ পোহাচ্ছে। ডালপালা থেকে তাদের মাথার ওপর ঝরে পড়ছে গরম জলের মোটা মোটা ফোঁটা।

বেঙ জাতের এই গোটা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন **স্টিগোসেফাল্**। বহু স্টিগোসেফালের ছিল তিনটে করে চোখ।

স্টিগোসেফাল্ রোদ পোহাচ্ছে। তার একটা চোখ বুজে এলো, দ্বিতীয়টাও বুজে এলো। কিন্তু মাথার ঠিক চাঁদিতে তৃতীয় যে-চোখটা আছে সেটা সজাগ — পাহারা দেয়।

অজানা কোন ছায়া এক ঝলক দেখা দিয়েছে কি দেয় নি, অমনি স্টিগোসেফাল্ ঝাঁপিয়ে পড়ল গভীর জলে।

পাখনা-হাতা মাছ প্রথম ডাঙায় উঠে আসতে সাহস করে।

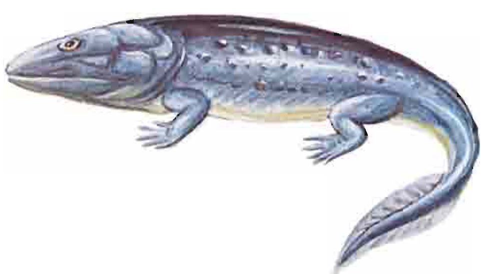

ইক্‌থিয়োস্টেগাস — এখন আর সে মাছ নয়, তবে পুরোপুরি স্টিগোসেফাল্‌ও তাকে বলা যায় না।

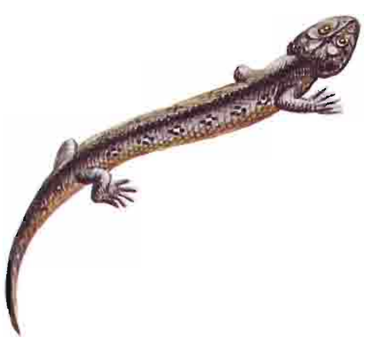

প্রথম যে-স্টিগোসেফাল্‌ ডাঙায় উঠে আসে তার নাম হল লেটোভেরপেটন।

জল থেকে ডাঙায়
৪০ কোটি বছর আগে

এই পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির একটির কথা।

প্রাচীন জীবনসৃষ্টির একেবারে শুরুতে পৃথিবী ছিল অন্ধকার, নিস্তব্ধ মরুভূমি। তার ওপর দিয়ে কেউ ছুটোছুটি করত না, কেউ হামা দিয়ে চলত না। কেবল কালো কালো পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও দেখা যেত শেওলাজাতীয় ছত্রাকের লাল আভা। সূর্যের কিরণ ছিল বড়ই নিষ্ঠুর — জীবন তার কবল থেকে আত্মগোপন করে সমুদ্রের মধ্যে।

জল থেকে প্রথম ডাঙায় উঠে আসে শেওলা। শত শত কোটি বছর ধরে মহাসাগরের তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে তারা তীরে এসে আছড়ে পড়তে থাকে। কোন কোন জাতের শেওলা ডাঙার আলো-বাতাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এমনই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে তারা শেষ পর্যন্ত মাটিতেই বসবাস করতে থাকে। যারা সাহসে বুক বেঁধে বাসা বদল করে, উপকূলের এই ঝোপঝাড়গুলিই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা সকলেই ছিল খুব ছোট। ছোট ছোট কাঁকড়া-বিছে, খোলায় ঢাকা মাকড়সা, খোলায় ঢাকা এঁটুলি জাতীয় পোকা আর বিছে, কেন্নো ইত্যাদি বহুপদ সরীসৃপ। সমুদ্রে তাদের বহু শত্রু ছিল, কিন্তু ডাঙায় মাত্র দুটি — সূর্যের প্রচণ্ড তাপ আর শুকনো বাতাস। এই কারণে ডাঙায় প্রথম বাসিন্দারা সাগর থেকে বেশি দূরে যেতে ভরসা পেত না, আত্মরক্ষার জন্য তাদের থাকত খোলওয়ালা ডুবুরির পোশাক।

এদের পর জল থেকে উঠে এলো পাখনা-হাতা মাছ। এই মাছদের ছিল মাংসল থাবার মতো পাখনা। আর ফুলকো ছাড়া তাদের ফুসফুসও ছিল, যাতে জলে ও স্থলে সমানভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া যায়।

প্রথম যারা ডাঙায় উঠেছিল তারা ক্রমেই তাদের জন্মভূমি সাগর থেকে দূরে আরও দূরে সরে যায়। এই দীর্ঘ পথযাত্রার মধ্য দিয়ে বিছে ও কেন্নোজাতীয় সরীসৃপদের বংশধররা হয়ে উঠল পোকামাকড় আর পাখনা-হাতা মাছদের বংশধররা হয়ে উঠল বেঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, পাখি ও জন্তুজানোয়ার।

জলরাজ্যের বাগানে
৪৩ কোটি বছর আগে

সূর্যের আলো-ঝলমল জলরাজ্যের বাগানে নীরবতা ও শান্তি। **সিন্ধু-শালুকের** সবুজ, লাল ও নীল রঙের ডাঁটাগুলি যেন ফুলে ফুলে ছাওয়া গাছপালার মতো তলা থেকে ওপরে উঠে এলো। তাদের ফাঁকে ফাঁকে তলায় পাঁকের মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে **ব্লাস্টোইডিয়ার** রঙিন মুকুল আর **সিস্টোইডিয়ার** পাকা আপেল। এ সবই হল প্রাণী, কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক শামুক আর তারামাছদের জ্ঞাতিগোত্র।

সিন্ধু-শালুকের ঝোপঝাড় থেকে সাঁতার কাটতে কাটতে বেরিয়ে আসে আশ্চর্য আশ্চর্য মাছেরা। আজকের দিন হলে সম্ভবত ওদের কেউ মাছ বলত না। কারও কারও গোটা শরীর অনড় খোলার ভেতরে, নড়ছে কেবল লেজ, অন্যেরা সে তুলনায় বেশি ছটফটে, পরন্তু যে কোন শত্রুকে বিদ্যুৎ তরঙ্গের আঘাত হানতে পারে। মাছেরা প্রত্যেকে যে যার নিজস্ব উপায়ে শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত।

সামান্য দূরে ছোট ছোট রুপোলি গাছের একটা ছোটখাটো কুঞ্জ। আমরা যতই আশ্চর্য হই না কেন, আমরা সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছি তারা হল হিংস্র প্রাণী। এরা **প্রবাল,** আজ যে-সমস্ত প্রবাল উষ্ণ সমুদ্রে বাস করে তাদেরই প্রাচীন জ্ঞাতি।

হঠাৎ জলে তোলপাড় উঠল। নীচের পলিমাটি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল ওপরে। মুকুল আর আপেলগুলি এদিক-ওদিক গড়িয়ে পড়ল। সমুদ্রের দস্যু **চিংড়ি-বিছে** গদাইলস্করি মার্কা মাছের ওপর হানা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দাড়া দিয়ে শিকার ধরে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। জল শান্ত হয়ে এলো। যে পলিমাটি ঘুলিয়ে উঠেছিল তা দেখতে দেখতে থিতিয়ে গেল। সূর্যের আলো-ঝলমল জলরাজ্যের বাগানে আবার নীরবতা ও শান্তি।

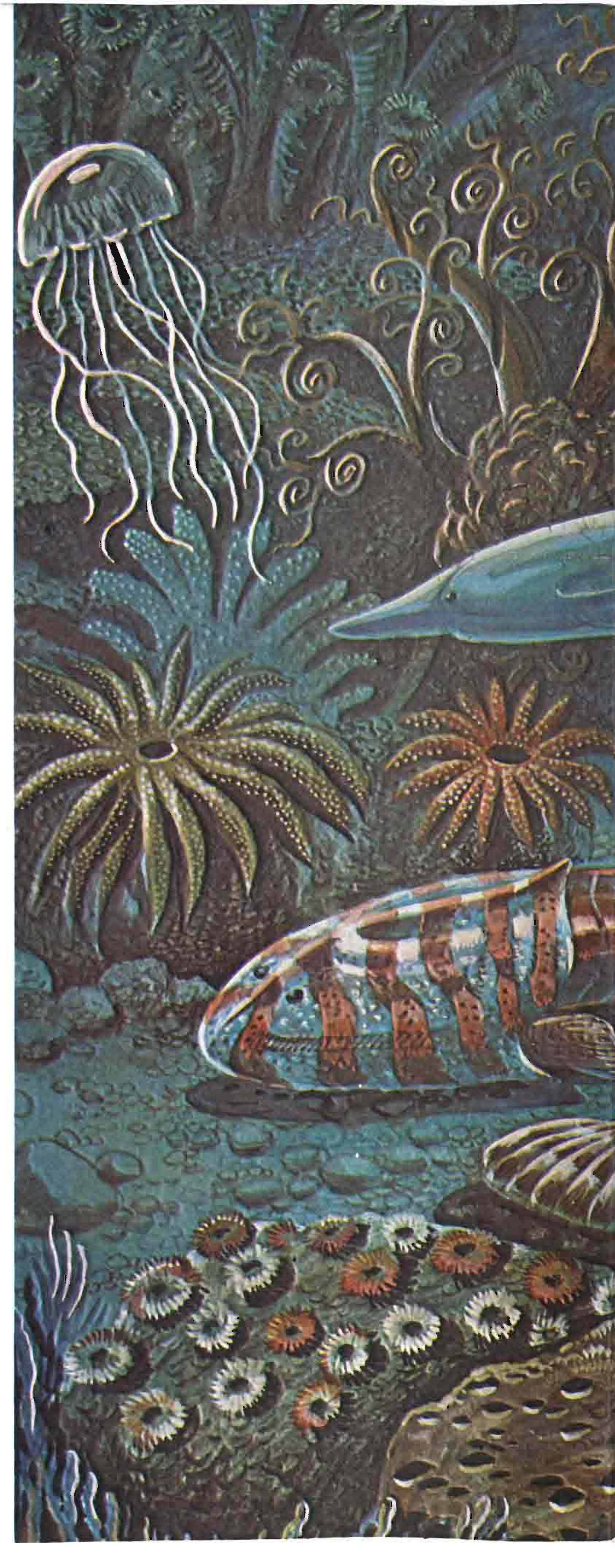

বড় বড় জেলিমাছেরা তখনও প্রায় আজকের মতোই ছিল।

অক্টোপাস ও কাট্‌ল মাছের জ্ঞাতি — শামুক-অক্টোপাস।

চিংড়িমাছের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ট্রিলোবাইট। ট্রিলোবাইটরা হত বড় বড় ও অতি ছোট; কেউ কেউ হত পুরো অন্ধ, কারও কারও বা চোখ থাকত লম্বা লম্বা কাণ্ডের ওপর।

মাছছাড়া সমুদ্র
৫৫ কোটি বছর আগে

জল টগবগ করে ফুটছে।

আঁকশির মতো শুঁড় আর শক্ত ঠোঁট খোলায় ঢাকা কোন একটা বিশাল ডেলা আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এ হল বড়সর আকারের ঘুণজাতীয় পোকার মতো দেখতে এক জীবের সঙ্গে — চিংড়ির দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি বিশাল **ট্রিলোবাইটের** সঙ্গে প্রাচীন সমুদ্রের অধিপতি **শামুক-অক্টোপাসের** মোলাকাত। ট্রিলোবাইট কখনই শামুক-অক্টোপাসের ওপর হামলা করত না, কেননা সে নেহাৎই ছোটখাটো শিকারের পক্ষপাতী। তা ছাড়া লম্বা শক্ত শামুকটার খোল যে সে পিষে ভাঙতে পারবে এমন আশাও তার ছিল না। প্রচণ্ড শক্তিশালী শুঁড়গুলিকে যে সে বাগে আনতে পারবে এবং নির্মম ঠোঁটের আঘাতে যে সে খাড়া থাকতে পারবে তা ছিল তার ভাবনার অতীত। কিন্তু, সে একটু গড়িমসিই করে ফেলে, পলিমাটির ভেতরে আত্মগোপন করার আর অবকাশ পেল কোথায়? তাকে এখন নামতে হল আত্মরক্ষায়। কিন্তু শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় কী? ওর নিজের ভুঁড়িটা যে নরম! অবশ্যই, শরীর গুটিয়ে দলা পাকিয়ে শত্রুর দিকে বর্মকঠিন পিঠ এগিয়ে দেওয়া। শামুক-অক্টোপাস কত রকম ভাবেই না ওটাকে বাগে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। দেখা গেল ট্রিলোবাইটটা তার পক্ষে রীতিমতো বড়। শামুক-অক্টোপাস অবসন্ন হয়ে আসতে তার শুঁড়ের বাঁধন আলগা করে দিতেই ট্রিলোবাইট ফুড়ুৎ করে পিছলে পলিমাটির ভেতরে চলে গেল, গুটানো শরীরটা খুলে সোজা করে নিয়ে চোখের পলকে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। এখন তাকে খুঁজে বার করে সাধ্যি কার! শামুক-অক্টোপাস চারপাশে তাকিয়ে দেখল, একই জায়গায় খানিকটা পাক খেল, তার পর সাঁতরে দূরে চলে গেল। আবার নীরবতা। কেবল জেলিমাছরা জলের ঠিক বুকের ওপরে তাদের মাথার টোপর নাড়ায়, আর সেকালের স্পঞ্জ ও অ্যাক্টিনিয়া সুন্দরীদের স্থির দেহগুলির মাঝখান দিয়ে তলায় চলেছে সমুদ্রের তারামাছেরা।

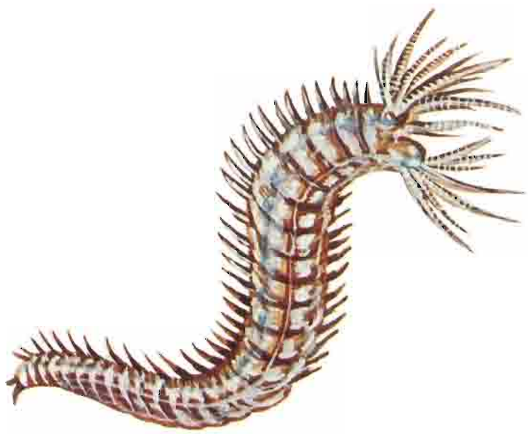

এখন সে নিজেই নড়াচড়া করতে পারে।

প্রথম সবুজ উদ্ভিদ ছিল অতি ক্ষুদ্র শেওলা।

স্বচ্ছ থলথলে জেলি, কিন্তু এই পিণ্ড এখন সজীব।

জীবনসৃষ্টির আদি কাল
৫৭ কোটি - ৩২০ কোটি বছর আগে

চেতন পদার্থের ইতিহাসে জীবনসৃষ্টির আদি কাল ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ ও রহস্যময়। সেই দূর অতীতে পৃথিবী দেখতে ছিল ভয়ঙ্কর, বসবাসের অনুপযোগী। কখনও এখানে, কখনও বা ওখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী আগ্নেয়গিরি গুরগুর গর্জন করছে, আর মাটিতে ফাটল ধরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে অগ্নিময় লাভাস্রোত, সে স্রোত গড়িয়ে চলেছে সীমাহীন ন্যাড়া মরুভূমির ওপর দিয়ে। কিন্তু মহাসাগরের ঈষদুষ্ণ ও সম্পূর্ণ লবণহীন জলের অঞ্চলে তখনই জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে। সমুদ্রের একেবারে উপরিভাগে সূর্যের গরম কিরণের মধ্যে ইতস্তত ভেসে চলেছে জেলি আকারে স্বচ্ছ পিণ্ডের অসংখ্য ঝাঁক। এই পিণ্ডগুলি ছিল এত ছোট যে তাদের নিরীক্ষণ করা যেতে পারত একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। ঢেউ তাদের আছড়ে ফেলে দিত তীরভূমির উপর, আবার স্রোত এসে বয়ে নিয়ে যেত সাগরের অতল গহ্বরে। তাতে পিণ্ডগুলি কাতারে কাতারে ধ্বংস হত। কিন্তু জীবন তাই বলে কখনও থেমে থাকে নি। শত শত কোটি বছর কেটে গেল, রহস্যজনকভাবে এই পিণ্ডগুলির বদল হল। তাদের মধ্যে কতকগুলি এক সঙ্গে মিলে গিয়ে রূপ নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নানা রকমের দেহব্যবস্থার। কতকগুলি হল শান্ত জীবনের পক্ষপাতী। তারা মাটির গভীরে নেমে গিয়ে তার সঙ্গে শক্ত হয়ে লেগে রইল। তাদের থেকে জন্ম হল উদ্ভিদের। কেউ বা সমুদ্রের যাযাবর জীবই হয়ে রইল। কেউ কেউ নিজের জন্য খোলার বাসা বানিয়ে ফেলে শামুক বনে গেল। কেউ বা দ্রুত নড়তেচড়তে শিখল। এই ব্যাপারটা তাদের জন্য হয়ে দাঁড়াল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন আর তারা ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক নয়, তারা ঢেউয়ের স্রোতের বিরুদ্ধে যুঝতে পারে, শিকার কব্জা করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাদের থেকেই উদ্ভব হল সেই সমস্ত প্রাণীর, যারা পৃথিবীতে বাস করত এবং এখনও করে।

I. Yakovleva

PALEONTOLOGY IN PICTURES

In Bengali

И. Яковлева

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ В КАРТИНКАХ

На языке бенгали

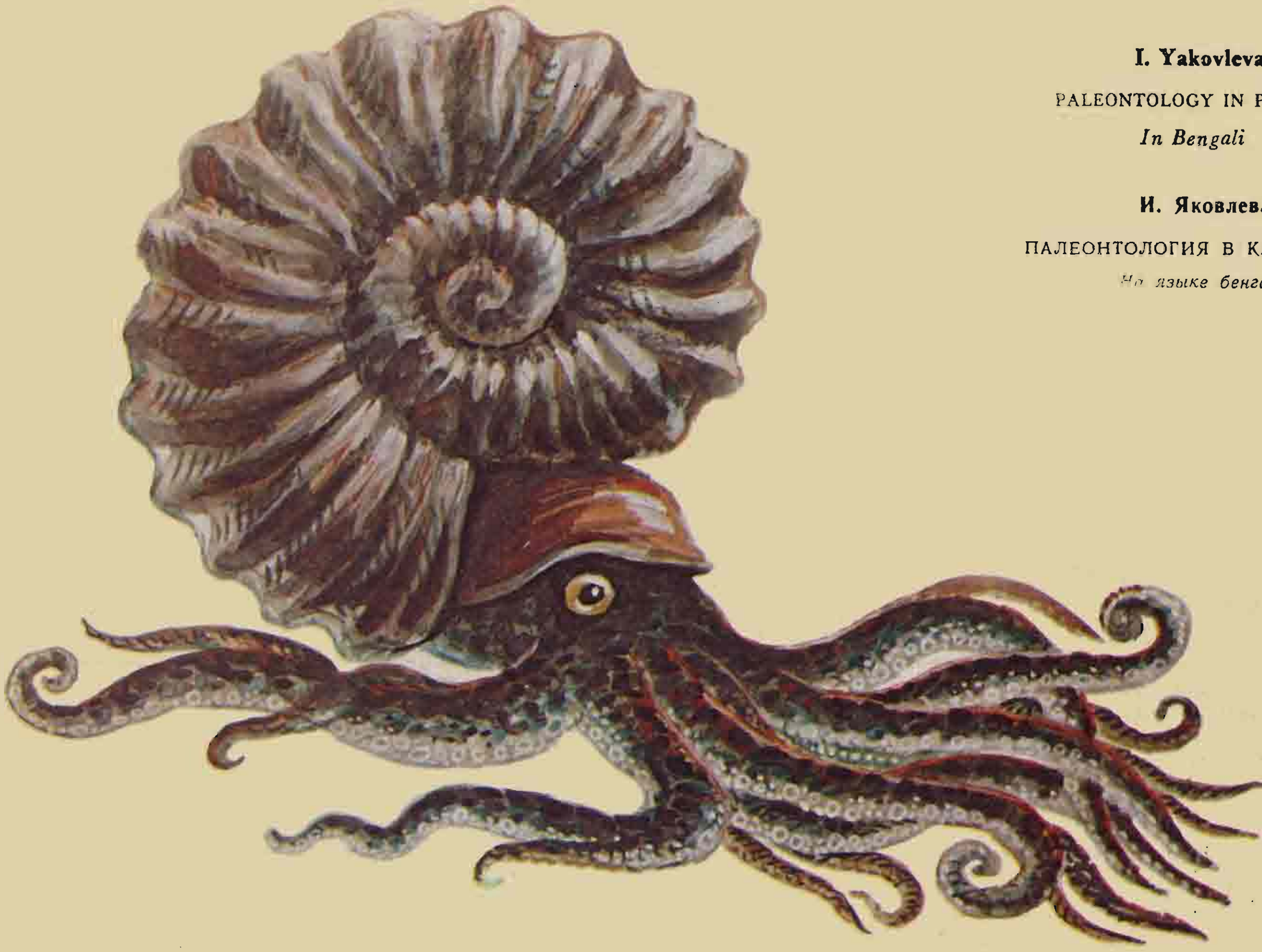

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

© বাংলা অনুবাদ · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৮৩
'দিয়েৎস্কায়া লিতেরাতুরা' প্রকাশন · ১৯৭৭

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Я $\frac{4803010102-498}{031(01)-83}$ 276—83